Vol. 52 | No. 2 | 2015

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

বুদ্ধদেব বসুর মৌলিনাথ : প্রসঙ্গ নির্মাণকলা

Volume	52
Issue	2
Year	2015
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Sohana Mahboob
Published online	February 1, 2015
DOI	10.62328/sp.v52i2.6
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v52i2.6
Pages	৮৯-১০৬
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

বুদ্ধদেব বসুর *মৌলিনাথ* : প্রসঙ্গ নির্মাণকলা

Check for updates

সোহানা মাহবুব*

আত্মমুগ্ধ এক কবির মগ্নচৈতন্যে লালিত কবিতাপ্রেমের শিল্পভাষ্য বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস *মৌলিনাথ* (১৯৫২)। কবিতা-দয়িতের ভারগ্রস্ত মৌলির অন্তর্বাস্তবতা রূপায়ণে এ উপন্যাসের নির্মাণকলায়ও লেখক গ্রহণ করেছিলেন এক অভিনব প্রকাশভঙ্গি। বুদ্ধদেবের 'উপন্যাসের well made অবয়ব সাহিত্যতত্ত্বের গজ-ফিতা মেনে অগ্রসর হয়নি। ... উপন্যাসের প্রেক্ষাপটে তিনি ব্যক্তির গূঢ় সত্তার গভীর উদ্ভাসনের মাধ্যমে সমগ্র ব্যক্তিত্বের ক্রম-উন্মোচন চেয়েছেন' (রহমান, ১৪১৫ : ১৩১)। *মৌলিনাথ* উপন্যাসেও কবিতার আবেগে দীপ্র সদ্য কৈশোরোত্তীর্ণ এক কবির চেতনা-গহ্বরের ক্রম উন্মোচন ঘটেছে। একজন কবি বা শিল্পীর প্রকৃতি বিশ্লেষণে রিলকের মতো বুদ্ধদেব বসুও বিশ্বাস করতেন, শিল্পী বা কবি মানেই ধীরে বিবর্তমান এক সত্তা। চেতনার অন্ধকারে নিমজ্জিত মৌলিকেও বুদ্ধদেব এ উপন্যাসে ক্রম উত্তরিত এক আলোকিত সত্তায় ভাস্বর করে তুলেছেন। মৌলিসত্তার এই ক্রম রূপান্তরের ইতিহাস ব্যাখ্যায় এ উপন্যাসে যে নির্মাণকলা ছিল অনিবার্য, সেটি প্রকাশিত হয়েছে ব্যক্তির 'বহিরঙ্গের অনুপুঙ্খ বিবরণধর্মী বাস্তবতার পরিবর্তে অন্তর্জীবনের গভীরতর বাস্তবতার সন্ধানে, অবচেতন আকাঙ্ক্ষার রূপায়ণে, চরিত্র অঙ্কনের পরিবর্তে ব্যক্তির আত্মান্বেষণে, চেতনাপ্রবাহ কিংবা অন্তঃসংলাপ রীতির ব্যবহারে, প্রচলিত সময় ধারণার পরিবর্তে সময়ের ভগ্ন-ক্রম বিন্যাসে, সূক্ষ্ম সংকেত-প্রতীক ও নিগূঢ় চিত্রকল্পের ব্যবহারে'র (ঘোষ, ১৯৯৭ : ৩১১-৩১২) মাধ্যমে।

মৌলিনাথ উপন্যাসের নির্মাণকলা আলোচনার পূর্বে এ উপন্যাস রচনার পটভূমি সম্পর্কে আলোচনা করা প্রয়োজন। আমৃত্যু একাকিত্বের ঘেরাটোপে বন্দি বুদ্ধদেব বসুর আত্মরূপ এবং রিলকে-বোদলেয়ার পাঠজাত আধুনিক ব্যক্তিসত্তার বিচ্ছিন্নতাবোধ-নৈঃসঙ্গ্যচেতনা, কবিতা-দয়িতের ভারগ্রস্ততা ও অহমবোধের মিথস্ক্রিয়ায় নির্মিত অন্তর্মুখী চরিত্র মৌলি। আত্ম-বিবরলালিত মৌলির বহির্জগৎকে দেখার সঙ্কুচিত অন্তর্মুখী দৃষ্টিভঙ্গির উৎস-বীজ নিহিত সমকালের গর্ভে। 'দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ পরবর্তীতে আমাদের ...ভেতরেও ভাবনা চিন্তার জগৎ বদলে যাচ্ছিল। অনেক আগেই এলিয়ট লিখেছিলেন ফাঁপা মানুষের কথা। বিচ্ছিন্ন একক হতাশাজর্জরিত ব্যক্তিমানুষের কথা কবিতায় এবং গদ্য উপন্যাসেও দেখা যাচ্ছিল ইউরোপ জুড়ে। জাঁ-পল-সার্ত (জ. ১৯০৫) এবং আলব্যর কামু (জ. ১৯১৩) ...তাদের উপন্যাসে যে সব চরিত্রের কথা বললেন তারাও এক হিসেবে বিশ শতকের বিচ্ছিন্নতাবোধ আক্রান্ত, আত্মসর্বস্বতার জালে আবদ্ধ অথচ চিন্তা ও মননবিদ্ধ মানুষ' (সেন, ২০০৮ : ৯৬)। আত্মসর্বস্বতার জালে বন্দি মৌলিও এদেরই উত্তরসূরী; চেতনায় সে বহন করেছে বোদলেয়ারের 'অচেনা মানুষের' মতো 'বেমানান... অতলান্ত নৈঃসঙ্গ্য'কে (ঘোষ, ১৯৯৭ : ৫০)। সুদক্ষিণা ঘোষ লিখেছেন :

* সহকারী অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

> বুদ্ধদেবের ষাট-সত্তরের দশকের লেখালেখিতে, যখন কাল হরণ করছেন বুদ্ধি, রোপণ করছেন উন্মাদনা, সেই অন্ধ অস্থির সময়ে এই নিঃসঙ্গ মানুষেরা আরো বেশি মাত্রায় ধরা দিচ্ছিল বুদ্ধদেবের কলমে। তার নাটকের চরিত্রদের কথাই মনে পড়ে সহজে, যেমন মনে পড়ে পাতা ঝরে যায় বা নেপথ্য নাটকে আধুনিক মানুষের যাপনের নিঃসঙ্গতা আর শূন্যতাকে। (ঘোষ, ২০১৩ : ১৪)

বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন (১৯০৫-১৯১১), প্রথম বিশ্বযুদ্ধ (১৯১৪-১৯১৮), স্বাধীনতা আন্দোলন (১৯১১-১৯৩৪) ও সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার মতো বৃহৎ ঘটনা সমগ্র ভারতেই ভাঙা-গড়ার পালা রচনা করেছে। ঘটনাবহুল এই সংকটকাল রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ভিত্তির মূলে সৃষ্টি করেছিল বিপর্যয়। ফলে সমাজ কাঠামোর অবতলে সৃষ্টি হয় বহুমাত্রিক জটিলতা। এই জটিলতা ব্যক্তিমানুষকেও প্রভাবিত করেছিল। ব্যক্তিমানুষ তাদের সংবেদনশীল সত্তায় এক প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতাবোধের সম্মুখীন হয়। বিচ্ছিন্নতাবোধ থেকেই নৈঃসঙ্গ্যচেতনা এবং একাকিত্বের ঘেরাটোপে বন্দি হয় এইসব ব্যক্তিসত্তা। বুদ্ধদেব বসুও এই কালেরই ধারকসত্তা বলে নিজের খণ্ডিত সত্তায় বহন করেছেন বিচ্ছিন্নতাবোধজাত নৈঃসঙ্গ্যকে। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে শিল্প-প্রসবজাত যন্ত্রণা। মৌলিনাথ বুদ্ধদেবেরই প্রতিরূপ-সত্তা। সে কারণেই কবিতা-দয়িতের ভারগ্রস্ত মৌলি কালের বিচ্ছিন্নতাবোধজাত নৈঃসঙ্গ্য আর শিল্প-প্রসবের যন্ত্রণায় পুরো উপন্যাস জুড়ে হয়েছে ক্ষতবিক্ষত, রক্তাক্ত। সে তার অন্তশ্চেতনায় বহন করেছে বোদলেয়ারের 'অচেনা মানুষ' কবিতার মতোই পরিজনহীন রোম্যান্টিক সংবেদনশীলতা। রিলকের মতোই মৌলি 'এমন এক কবি, যিনি সর্বতোভাবে কবি হ'তে চেয়েছিলেন। প্রতিদিন, প্রতিমুহূর্তে কবি' (বসু, ১৯৭০ : ১১)। বিচ্ছিন্নতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধজাত রোম্যান্টিকতাই এই অন্তর্মুখী কবিপ্রাণের কাছে উষ্ণতার আধার। 'সঙ্গ, নিঃসঙ্গতা — এ দুটো যে একই কথা অন্তত কবির পক্ষে, এমন কথাই বলেছিলেন বোদলেয়ার, কারণ, বলেছিলেন তিনি, কবিরই আছে সেই ক্ষমতা, যাতে তাঁরা তাঁদের নিঃসঙ্গতাকেও করে তুলতে পারেন সঙ্গময় আর মহানগরীর জনতার কোলাহলেও গড়ে নিতে পারেন নিজস্ব নির্জনতা, ...' (ঘোষ, ২০১৩ : ১৬)। রাইনের মারিয়া রিলকের কবিতা অনুবাদ করতে গিয়ে ভূমিকার প্রথম বাক্যেই বুদ্ধদেব মন্তব্য করেন :

> রিলকে ... যার কাছে তার জীবন ছিলো তাঁর অন্তর্নিহিত অনলের ইন্ধনমাত্র। ...যার বিষয়ে আমাদের প্রায় সন্দেহ হয় যে তিনি সাধারণ অর্থে বেঁচে থাকতে চাননি কখনো, চেয়েছিলেন শুধু নিজেকে কবিতার একটি বাহন করে তুলতে...। (বসু, ১৯৭০ : ১১)

রিলকের কবিসত্তা-উচ্চারিত উপর্যুক্ত বক্তব্যের অদ্ভুত অনুরণন শোনা যাবে মৌলির কবিত্ব-দর্শনে, — 'অনায়াসের প্রতি অবজ্ঞা'ই ছিল যার মর্মবাণী। মূলত *মৌলিনাথ* 'উপন্যাসটি মনোজগতের অভিজ্ঞতার উন্মীলন, বিকাশ ও পরিণতির দৃশ্যকল্প ... কবিতা স্রষ্টার সৃষ্টিশীল সত্তা পর্যবেক্ষণের প্রাকন্তর' (কামাল, ২০০৭ : ১৪৬)। মৌলির এই মনোজাগতিক অভিজ্ঞতা উন্মীলনে উপন্যাসে যে নির্মাণকলা প্রয়োগ করেছেন লেখক, সে-সম্পর্কে আলোকপাত করাই বর্তমান প্রবন্ধের উপজীব্য বিষয়।

মৌলিনাথ উপন্যাসকে গীতিকাব্যিক উপন্যাস (lyrical fiction) বলা যেতে পারে। কারণ গীতিকাব্যিক উপন্যাসে (lyrical fiction) 'গীতিকবিতার আমি'কে করে তোলা হয়

প্রোটাগনিস্ট, যে তার প্রত্যক্ষণ দিয়ে জগতকে নতুন করে গড়ে তোলে, সেই উপলব্ধি কল্পনা (imagination) আকারে সে উপস্থিত করে। এই গীতিকাব্যিক উপন্যাস plot of action-এর উপর নির্ভর করে না। ... গীতিকাব্যিক উপন্যাসে থাকে গীতিকবিতার কলাকৌশল, যাতে স্থানচিত্র (spatial form) থাকে একটি মেটাফরকে কেন্দ্রে রেখে ন্যারেটিভের গঠন। ... এখানে ন্যারেটর, যে বা যারা তারা সকলেই আত্মসচেতন, তারা দেখা জগতকে পরিবর্তিত করে (modify) নেয়। ... গীতিকাব্যিক উপন্যাসে ন্যারেটিভ এবং কবিতা দুয়েরই উপাদান ব্যবহারের চেষ্টা দেখা যায়। তবে সেখানে থাকে এক কবিত্বময় অ্যাপ্রোচের ব্যাপার। অনুভব রূপায়ণের লক্ষ ঠিকই থাকে। তবে প্রধান আগ্রহ থাকে নায়কের ভূমিকা নিয়ে, কারণ সেই হল কবির আইডিয়াল ইমেজ। ... লেখক গীতিকাব্যিক উপন্যাসের ক্ষেত্রে রোমান্টিক এক্রাইল এর উত্তরাধিকার ভূমিকা গ্রহণ করেন। স্ট্রিম অফ কনসাসনেস গীতিকাব্যিক উপন্যাসে একটা বড়ো কৌশল। টি.এস. এলিয়ট বলতে চেয়েছিলেন যে এ ধরনের উপন্যাসকে পাঠক কবিতা হিসেবেই দেখে। আর উপন্যাসে প্রতিফলিত বিশ্ব যেন স্বগতোক্তিকারীর ইমেজ সংগ্রহ (যা লেখকেরও), যার থেকে চরিত্র ও সংঘটন গড়ে ওঠে' (পাল, ২০১৩ : ১৯-২০)। মৌলি এ উপন্যাসের মুখ্য (protagonist) চরিত্র, যার ব্যক্তিক স্বপ্নকল্পনা ও ভাবনাবেদনা-অনুভব এখানে গীতল ভাষায় প্রকাশিত।

মৌলিনাথ প্রচলিত কাঠামো-অবলম্বী উপন্যাস নয়। এর স্বল্পায়তনিক ও একরৈখিক কাহিনিবৃত্ত আদি-মধ্য-অন্ত সম্বলিত ভিক্টোরীয় রীতিকে অনুসরণ করেনি। মৌলির অন্তশ্চেতনার গতিপ্রকৃতি ধারণ করতে গিয়ে এ উপন্যাসকে চেতনাপ্রবাহরীতির আশ্রয় গ্রহণ করতে হয়েছে। এ কারণেই উপন্যাসটি কোনো প্রচলিত কাঠামোর ভেতর আবদ্ধ নয়। মৌলির অন্তর্জগৎ এবং তাকে কেন্দ্র করে বহির্জাগতিক সম্পর্ক-দ্বন্দ্বের টানাপড়েনে নির্মিত এ উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত। উপন্যাসের কাহিনিবৃত্ত চারটি খণ্ডে বিভাজিত হলেও এদের ভেতর অন্তর্গত সম্পর্ক রয়েছে এবং সেই সম্পর্কসূত্র হলো মৌলিনাথ স্বয়ং। প্রথম খণ্ডের অনেক কাহিনি-অনুষঙ্গ স্মৃতিময়তার মধ্য দিয়ে দ্বিতীয় খণ্ডে অস্তিত্ববান হয়ে উঠেছে। সুতরাং খণ্ডগুলো স্বাধীনভাবে কোনো কাহিনিবৃত্ত নির্মাণের সামর্থ্য রাখেনি।

এ উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের নাম 'একটি গ্রীষ্মের সকাল'। মৌলির কবি হয়ে ওঠার মূল সূত্রগুলো এখানেই চিহ্নিত। উপন্যাসের কেন্দ্রীয় নারী চরিত্রের সাথে মৌলির হার্দ্য সম্পর্কের অব্যক্ত অনুরণনের বহিঃপ্রকাশ, চিত্রা ও মৌলির আত্মিক সাযুজ্য ও দ্বন্দ্বের প্রস্ফুটায়ন, মৌলির জীবন থেকে চিত্রার স্বেচ্ছানির্গমন এবং এ খণ্ডের শেষে গীতার একঝলক উপস্থিতি দ্বিতীয় খণ্ডের কাহিনি পরিণামকে নির্দেশ করে দেয়। মৌলির নবোদ্ভিন্ন কবিসত্তার স্ফুরণ এবং চিত্রার সাথে তার আত্মিক যোগ সংঘটনে এ খণ্ডের প্রাসঙ্গিকতা উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ। মৌলি ও চিত্রার হার্দ্য সম্পর্কের অনুরণন চেতনাপ্রবাহরীতির মাধ্যমে আত্মপ্রকাশ করলেও প্রথম খণ্ডেই তাদের রোমান্স প্রগাঢ়ভাবে প্রকাশিত। প্রথম খণ্ড ও দ্বিতীয় খণ্ডের সময় ব্যবধান দশ বছর। প্রায় দশ বছর পরের পুরানা পল্টনের ক্রমবর্ধিষ্ণু রূপের পাশাপাশি পাঠক সাতাশ বছরের প্রাজ্ঞ ও বার্ধক্যবোধে পীড়িত মৌলিকে আবিষ্কার করেন এখানে। মৌলির মনের ভেতর তখন এই দ্বন্দ্বের আলোড়ন প্রগাঢ়ভাবে সক্রিয় :

'বেঁচে থাকা, আর শিল্পী হওয়া, এ দুই কি একই সঙ্গে সম্ভব?' (বসু, ১৩৯১ : ১৭৩)। মৌলির আত্মযন্ত্রণা, বিচ্ছিন্নতাবোধ এবং অস্তিত্বের টানাপড়েন এ খণ্ডে প্রগাঢ় হয়ে উঠেছে। Ralph Friedman কাব্যময় উপন্যাস প্রসঙ্গে মন্তব্য করেছেন : এ ধরনের উপন্যাসে রয়ে যায় 'confrontation between self and world' বা আত্ম ও বিশ্বের দ্বন্দ্ব (পাল, ২০১৩ : ১৯)। মৌলিও তার অন্তঃসত্তায় এ দ্বন্দ্ব বহন করেছে।

দ্বিতীয় খণ্ডের শুরুতেই লেখক গীতার অনুপ্রবেশ ঘটিয়েছেন। গীতা ও মৌলির পারস্পরিক কথোপকথন, গীতার আত্মকথন, মৌলির সঙ্গে তার স্বভাবগত ও চেতনাগত সাযুজ্য-বৈপরীত্য থেকে পাঠকের মনে হতে পারে এ খণ্ডে মৌলি-গীতা পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হতে পারে। কিন্তু শেষপর্যন্ত মৌলি কর্তৃক গীতাকে প্রত্যাখ্যানের নাটকীয় চমকের মধ্য দিয়ে এ খণ্ডের সমাপ্তি ঘটে। দ্বিতীয় খণ্ডে কাল ও পরিবেশগত পরিবর্তন ঘটলেও স্থানগত পরিবর্তন ঘটেনি। প্রথম খণ্ডেরই প্রলম্বিত অংশ দ্বিতীয় খণ্ড। তৃতীয় খণ্ডে গিয়ে স্থান কাল এবং পরিবেশ এ তিনটি উপাদানেরই পরিবর্তন লক্ষ করা যাবে। তৃতীয় খণ্ডে ঢাকার পটভূমি পরিবর্তিত হয়ে কলকাতার এক ছোট ঘরের পট উন্মোচিত হয়েছে। জীবনোত্তাপহীন এই ঘরে খণ্ডের শুরুতেই মৌলির গীতল-স্বপ্নের সম্মুখীন হন পাঠক। তার স্বপ্নে যে নারী-ইমেজ প্রতিস্থাপিত হয়েছে — সেটি চিত্রার। অবচেতনে এই কবিসত্তা তখন পর্যন্ত চিত্রাকেই ধারণ করে আছে। পুরো খণ্ড জুড়ে কবিতা-দয়িতের ভারবাহী এক ব্যক্তিসত্তার জড় ও নিশ্চল চিত্র রচিত হয়েছে। এরই মধ্যে মৌলির একঘেয়ে শহুরে জীবনপটে চিত্রার আগমন ঘটেছে। লেখক flash back-এর মধ্য দিয়ে মৌলি ও চিত্রাকে স্মৃতিকাতর করে অতীত সময়কে তুলে এনে ঘটনাক্রম ও সময়ক্রম ভেঙে দিয়েছেন। তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশে চিত্রার নিমন্ত্রণে জড়বদ্ধ ও অভিশাপগ্রস্ত মৌলি যেন জীবনের উত্তাপ আবার ফিরে পায়। চিত্রা-গীতার উষ্ণ পারিবারিক আবহ ভেঙে দেয় তার জীবন-বাস্তবতারহিত শিল্পভুবনকেন্দ্রিক নিঃসঙ্গতা। আটপৌরে বস্তুজীবনকে ছুঁয়েছেনে শিল্পরচনা করা সম্ভব নয় — মৌলির মজ্জাগত এই ভাবনাই তাকে শিল্পরচনার খাতিরে চিত্রা এবং গীতাকে ফিরিয়ে দিতে বাধ্য করেছিল। জীবনবিমুখ মৌলি তৃতীয় খণ্ডের শেষে তার মৃত আত্মাকে জেগে ওঠার আহ্বান জানায়। জীবনের তুচ্ছ মধুর রাগিণী তার এতদিনকার জমাট অন্তর্বেদনাকে 'তপ্ত কঠিন চোখের জলে' দ্রবীভূত করে তোলে। জীবনকে আঁকড়ে ধরেই বাঁচার আকাঙ্ক্ষা জেগে ওঠে তাঁর কণ্ঠে : 'হৃদয়, আমার মৃত হৃদয়, তুমি জেগে ওঠো, বেঁচে ওঠো আবার'। (বসু, ১৩৯১ : ২৩৩)

উপন্যাসের শেষ খণ্ডের শিরোনাম 'একটি বসন্তের রাত্রি'। এ খণ্ডে গীতা এবং বিমলেন্দুকে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি চিঠিতে মৌলি নিজের আত্মদ্বন্দ্বের প্রকাশ ঘটিয়ে তাঁর দুর্বলতাকে চিহ্নিত করে দিয়েছে। স্বীকারোক্তির (confession) মধ্য দিয়ে মৌলির সমস্ত গ্লানি ধুয়ে মুছে গেছে এখানে। শিল্পসত্তাজাত অহমবোধ থেকে বেরিয়ে এসে জনতার একজন হয়ে ওঠার আকাঙ্ক্ষায় এ খণ্ডের পট পরিবর্তিত হয়ে গেছে। জীবনের মধুপান করে, জীবনকে ছুঁয়েছেনে শিল্পরচনার প্রয়াস পেয়েছে মৌলি। তারই প্রতীক হয়ে উঠেছে সভ্যতার আলো-বিবর্জিত হট্টিমারিয়া । উদ্দীপক শক্তি হিসেবে কাজ করেছে চিত্রার উষ্ণ

সান্নিধ্য। জীবনের সার্থকতা ও ব্যর্থতার পরিচয় লিপিবদ্ধ করে সহজ পথে নেমে আসার ক্ষেত্রে মৌলির ঘনিষ্ঠ উচ্চারণ :

> ... আমার না-লেখা বই আলোর মধ্যে বেড়ে উঠছে তোমাদের অপেক্ষমাণ সন্তানের মতো। মিলিত হও, গীতা ... আমার জন্য থাক আমার নির্জনতা ... আমার ক্লান্তির কালো-কালো ফুলগুলি হো মেয়ের হাসির স্রোতে ভেসে যাক। আমি রওনা হলাম ... পৃথিবীর ধুলো-হাওয়ায় মেখে-মেখে, বৃষ্টির মতো শিকড়ে-শিকড়ে বয়ে যেতে-যেতে, হয়তো আমি নিজেকে সহ্য করতে শিখবো কোনোদিন, ক্ষমা করতে পারবো শেষপর্যন্ত, কোন-একদিন কোনো একটি লেখা শেষ করে জেনে যাবো যে আমার বেঁচে থাকাটা একেবারেই ব্যর্থ হয়নি। (বসু, ১৩৯১ : ২৩৮)

এভাবেই চারটি খণ্ড জুড়ে মৌলি চরিত্রের টানাপড়েন, দ্বন্দ্ব, চিত্রা ও গীতা সম্পর্কিত ভাবনা-অনুষঙ্গ মৌলির কবিসত্তার রূপান্তর ঘটিয়েছে। প্রথম খণ্ড মৌলির কবিসত্তার উন্মেষপর্বকে ধারণ করেছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় খণ্ডে মৌলির আত্মযন্ত্রণা ও আত্মদ্বন্দ্ব এবং তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশ ও চতুর্থ খণ্ডে তার আত্মোপলব্ধিজাত অনুশোচনামূলক স্বীকারোক্তি তার কবিসত্তাকে পূর্ণতা দিয়েছে। তাই চারটি খণ্ড এ উপন্যাসের ঘটনাক্রম বিবর্তনে গুরুত্ব বহন করেছে।

কাহিনিবিন্যাসের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান হল মিলিউ বা পরিবেশ। *মৌলিনাথ* 'inner reality' অবলম্বী উপন্যাস হলেও মিলিউ-এর ভূমিকা এ উপন্যাসে একেবারে গৌণ নয়। তবে উপন্যাসে মৌলির সুনির্দিষ্ট পারিবারিক প্রেক্ষাপট থাকলেও সেটি অবজেকটিভ নয় — সাবজেকটিভ চিত্ররূপ। গোপিকানাথ রায়চৌধুরী মন্তব্য করেছেন :

> স্থান-পরিবেশ সাধারণত উপন্যাসে অবজেক্টিভ ও সাবজেক্টিভ দুভাবেই আত্মপ্রকাশ করে। অবজেক্টিভ পরিবেশ বর্ণনা প্রধানত ঘটনাকে ব্যাখ্যা করার কাজে — কতকটা মঞ্চের পেছনের দৃশ্যপটের মতো ব্যবহৃত হয়ে থাকে। আর সাবজেক্টিভভাবে পরিবেশ বর্ণনায় সার্থকতা সেখানেই, যেখানে তা কোন বিশেষ চরিত্রের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট। একালের উপন্যাসে যেখানে মনস্তাত্ত্বিক বিচার-বিশ্লেষণের প্রাধান্য সেখানে ওই সাবজেক্টিভ ধরনের পরিবেশ বর্ণনার প্রয়োগ বেশী চোখে পড়ে। (চৌধুরী, ১৯৮৪ : ৬৯-৭০)

মৌলিনাথ উপন্যাসে ঢাকার পুরানা পল্টন, কলকাতা ও হট্টিমারিয়া এসেছে প্রত্যক্ষভাবে। দিল্লি এবং বিলেতের বর্ণনা আমরা পাই চিত্রা ও গীতার ভাষ্যে। মৌলির নবোদ্ভিন্ন কবিসত্তা, তার ক্রমপরিণতি এবং কবিতা-দয়িতের ভারগ্রস্ততা যেন পুরানা পল্টনের অপরিণত অবস্থার প্রতীক। অন্যদিকে মৌলির কলকাতার জীবন যেন যান্ত্রিক শৃঙ্খলাবদ্ধ কলকাতার পরিবেশকেই প্রতীকায়িত করে। স্থান-পরিবেশ ব্যক্তিকেন্দ্রিক এ উপন্যাসে এভাবেই সাবজেকটিভ হয়ে উঠেছে।

এ উপন্যাসের সময় বিন্যাসেও লেখক অভিনবত্বের পরিচয় দিয়েছেন। মৌলির অন্তশ্চেতনায় বহমান সময়কে লেখক চমৎকার দক্ষতায় উপন্যাসে বিন্যস্ত করেছেন। সময় বিন্যাসে চেতনাপ্রবাহরীতি ব্যবহৃত হয়েছে বলেই এর সময় ধারণা বহিরাঙ্গিক (outward) নয়, বরং সেটি অন্তর্বাহী (inward)। কালপারম্পর্য রক্ষিত হয়নি উপন্যাসের সময়

বিন্যাসে। 'সময়ের এ ধরনের প্রয়োগ চোখে পড়ে আধুনিক উপন্যাসে — যেখানে কালকে সংহত সীমায় বেঁধে রাখার পিছনে প্রায়ই চমকপ্রদ নাট্যরস সৃষ্টির প্রয়াস থাকে না। থাকে মনোলোকের অতলে অবগাহনের গূঢ় এষণা, যেখানে নিখুঁত কাল-পারম্পর্যের বদলে অন্তত আংশিক কালবিপর্যয় ঘটিয়ে ব্যক্তির জীবনরহস্যের উপর আলোকসম্পাতের প্রচেষ্টা চোখে পড়ে' (চৌধুরী, ১৯৮৪ : ৪০)। স্মৃতিময়তার মধ্য দিয়ে *মৌলিনাথ* উপন্যাসে সময়ের ভাঙচুর ঘটেছে। চরিত্রগুলোর চেতনার গতি-প্রকৃতি সময়ের কালানুক্রম অনুসারে চলেনি।

এ উপন্যাসের দ্বিতীয় খণ্ড থেকে বুদ্ধদেব বসুর কালচেতনার স্বরূপ উপলব্ধ হবে :

> এই যাকে আমরা অতীত বলি, প্রতি মুহূর্তে বদলে যাচ্ছে, মুছে যাচ্ছে, মিশে যাচ্ছে বর্তমানের স্রোতের মধ্যে — কোনো একটি মুহূর্ত সেই মুহূর্তকালের বেশি দাঁড়িয়ে থাকবে না — অথচ কোথাও সব হয়ে যাওয়ার একটা নিজস্ব সত্তাও আছে যেন, সেখান থেকে কিছুতেই তাকে নড়ানো যাবে না। যা ছিলো তাকে এখন দেখলে চিনতেই পারবো না। কিন্তু যা কোনো-একদিন ছিলো তা যেন চিরকাল ধ'রেই আছে। চিরকাল, চিত্রা, চিরকাল। (বসু, ১৩৯১ : ১৯৪)

অতীত বর্তমান আর ভবিষ্যতের নিরন্তর প্রবহমানতায় মৌলির জীবনের শাশ্বত এক উচ্চারণ চিত্রা। চিত্রাকে মনোচেতনার স্থির বিন্দু করেই মৌলির চেতনসত্তা কখনো স্মৃতিকাতরতায় হয়েছে অতীতচারী, কখনো বা বর্তমান ছুঁয়ে ভবিষ্যৎমুখী। ব্যক্তিচেতনার এই ক্রম পরিবর্তনশীলতা মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে এভাবেই সময়ের ক্রম-ভঙ্গ ঘটায়। মূলত 'নৈঃসঙ্গ্যচেতনা ব্যক্তিচৈতন্যে জন্ম দেয় নস্টালজিয়া বা অতীতস্মৃতিমুগ্ধতা। বর্তমানের অবরুদ্ধ ও বৈরি পরিবেশে ব্যক্তিমানুষ অন্তর্লীনসত্তায় হারিয়ে যায় তার শৈশবস্মৃতিতে, প্রথম যৌবনের টালমাটাল দিনগুলোতে। নৈঃসঙ্গ্যপীড়িত ব্যক্তির কাছে বর্তমান হয়ে দাঁড়ায় মূল্যহীন, অতীত তার কাছে ধরা দেয় হিরন্ময় সত্তায়। ভবিষ্যৎ সুখ-স্বপ্নের পরিবর্তে অতীতের জীর্ণ-ধূসর অলি-গলিতে সে খোঁজে মুক্তির অধরা আস্বাদ' (ঘোষ, ১৯৯৭ : ৩৭)। মৌলির নৈঃসঙ্গ্যপ্রিয় চেতনা কিংবা গীতা ও চিত্রা এভাবেই হয়েছে নস্টালজিক, অতীতচারী। তৃতীয় খণ্ডের শেষাংশে চিত্রার বাড়িতে নিমন্ত্রণ খেয়ে ফেরার পর ফ্ল্যাশব্যাক পদ্ধতিতে মৌলি গীতা-চিত্রার উষ্ণ পারিবারিক আবহের স্মৃতিচারণায় মগ্ন হয়েছে। মৌলির চেতনার স্রোতে ভেসে আসে সেই উৎসবমুখর উষ্ণ আবহ :

> ... কোথায় ছিলো সে এতক্ষণ? অন্য এক দেশে, অন্য এক জগতে। ... সে কি সেখানে ... আগন্তুক, ...। প্রথমে তাই মনে হয়েছিলো তার ... কিন্তু তারপর প্রথম ক-টি কথা যেই বলা হলো, দেখা হলো চারদিকে একবার তাকিয়ে– তরুণ-তরুণী, শিশুরা, মৃদুভাষিণী বৃদ্ধা — যে মুহূর্তে এ সব টুকরো ছবি পরস্পরে গ্রথিত হয়ে চলমান একটি দৃশ্য হয়ে উঠলো তার চোখের সামনে, তখন থেকে কিছুই তার করবার থাকলো না — কিছু করবার, ভাববার, বলবার চেষ্টা থেকে ছিন্ন হয়ে ভেসে গেলো সে, ঘণ্টা কাটলো, আরো ঘণ্টা, মৌলিকে ফাঁকি দিয়ে বয়ে গেলো সময় ... নম্র গলায় বিমলেন্দু জানতে চাইলো মৌলিনাথের নতুন বইয়ের খবর, ... কখন এসে মহেন্দ্রবাবু তাতে যোগ দিলেন। একটু পরে মহিলারা এলেন সেখানে ... মৌলি এ-আলোচনায় যোগ দিলো না।... কিন্তু তার ভালো লাগলো বসে থাকতে, ... যখন এতগুলি মানুষের গলা একেঁ-বেঁকে ঘুরছে তার চারদিকে। ... টুকরো হয়ে, বিক্ষিপ্ত হয়ে কোনোরকম

> পারম্পর্য রক্ষা না করে অন্ধকারের পটের উপর দিয়ে ভেসে গেলো এলোমেলো তরল এই দৃশ্যগুলি... ঐ তো সে, গীতা ... পরিষ্কার দুটি ভুরুর তলায় চোখের রং হালকা দেখায় আগের চাইতে, ... শুধু ঐ চোখ দুটি আমাকে দেখতে দাও, নির্মল চোখ তোমার — যেখানে আর প্রশ্ন নেই, বিক্ষোভ নেই, নেই মেঘ, মেঘের বুকে বিদ্যুতের ঝিলিক কোন দূর সান্ধ্য ঝড়ে যা-কিছু তুমি কুড়িয়েছিলে, তার কোনো চিহ্ন আর আঁকা নেই যেখানে। ... গীতা। চিত্রা। বালিশের কানে নিঃশ্বাসের স্বরে উচ্চারণ করলো মৌলি। (বসু, ১৩৯১ : ২৩২)

শুধু মৌলিই নয়, স্মৃতিকাতরতায় নস্টালজিক হয়েছে চিত্রা এবং গীতাও। মৌলির বাড়ি যাবার পথে গাড়ির নরম গদিতে ডুবে গিয়ে যেন চিত্রা প্রগাঢ়ভাবে অতীতকেই খুঁড়ে বের করে এনেছে :

> ... মনের উপর দিয়ে স্রোতের মতো বয়ে গেলো বছরগুলি। ... কতকাল পরে দেখা হবে? বারো, চৌদ্দ, পনেরো বছর? নাকি যুগযুগান্ত? মহিলাটি চোখ বুজলেন, বোজা চোখের অন্ধকারে ফুটে উঠলো মস্ত বড় মাঠ, সাদা ধুলোর রাস্তা, বটগাছের ঝিকিমিকি শরীর। সেই গাছের ছায়ায় বসে টেম্পেস্ট পড়া হচ্ছিলো একদিন। দুপুরবেলা একটু মেঘলা। খুব হাওয়া ছিল, হাওয়ায় উড়ে যাচ্ছিল কবিতা। পাতার মর্মর শব্দে ডুবে যাচ্ছিল। কিন্তু শুনতে পাইনি, শুনতে চাইনি... দেখছিলাম। হঠাৎ চোখ পড়লো আমার চোখে — পড়া থেমে গেলো। কেউ উঠলাম না, কেউ কিছু বললাম না, হাওয়া বয়ে গেলো মাঠের উপর দিয়ে, আকাশে মেঘ ভেসে গেলো। বাড়ি ফিরে সেদিন অনেক চোরকাটা বাঁচতে হয়েছিলো শাড়ি থেকে ... (বসু, ১৩৯১ : ২২০)।

বুদ্ধদেব বসু সময় বিন্যাসে চেতনাপ্রবাহরীতির ব্যবহার প্রসঙ্গে জেমস জয়েস, হাক্সলি ও ভার্জিনিয়া উলফের উপন্যাস সম্পর্কে লিখেছেন :

> এঁদের উপন্যাসে ঘটনার স্থান একেবারে তলায় এসে ঠেকেছে, কেননা, ঘটনার কোন নিজস্ব মূল্য নেই। ঘটনাকে উপলক্ষ করে মানুষের চিন্তাস্রোত ঘুলিয়ে ওঠে, এবং সব সময় সে ঘটনা জমকালো গোছের হওয়ার দরকার করে না (বন্দ্যোপাধ্যায়, ২০১০ : ১৫১)।

*মৌলিনাথে*ও ঘটনার ঘনঘটা নেই — আছে চেতনাস্রোতে জেগে ওঠা স্মৃতিপুঞ্জ। এ উপন্যাসে প্রথম খণ্ড থেকে দ্বিতীয় খণ্ডের মধ্যবর্তী কালের ব্যবধান পাঁচ বছর এবং দ্বিতীয় খণ্ড থেকে তৃতীয় খণ্ডের মধ্যবর্তী কালের ব্যবধান দশ বছর। তৃতীয় খণ্ড থেকে উপসংহার পর্যন্ত কয়েকদিনের ব্যবধান উপলব্ধি করা যাবে। উপন্যাসে সচেতনভাবে ঋতু পরিক্রমার মধ্য দিয়ে কালিক বিবর্তন বিন্যস্ত হয়েছে। যদিও গ্রীষ্ম-বর্ষা-শীত-বসন্ত — এই চারটি ঋতু কালানুক্রম রক্ষা করে বিন্যস্ত হলেও ঋতুগুলো একই বছরের নয়। লেখক পনের বছরের অধিক কালকে রূপ দিয়েছেন মাত্র চারটি নির্দিষ্ট দিনের অভ্যন্তরে। আর এভাবেই লেখক এ উপন্যাসে যান্ত্রিক সময়ের পরিবর্তে মনস্তাত্ত্বিক সময় ব্যবহারে সফল হয়েছেন।

মৌলিনাথ উপন্যাসে প্লটের তুলনায় চরিত্রায়ণ কৌশলের উপর লেখক গুরুত্ব দিয়েছেন বেশি। চরিত্রের বহির্বাস্তবতার তুলনায় অন্তর্বাস্তবতার (inner reality) স্বরূপ উন্মোচনই ছিল লেখকের মূল উপজীব্য। এ উপন্যাসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তাই মৌলিনাথের ক্রম রূপান্তরিত ব্যক্তিসত্তার রূপচিত্র মেলে। 'আত্মভাবনার জগৎ হ'তে নিষ্ক্রমণ অপেক্ষা নিরন্তর

সঞ্চরণে অধিক স্বচ্ছন্দ' (মালাকার, ১৪১৪ : ১২৫) মৌলি এক বৃত্তাকার চরিত্র (round character), যার চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যের অভিনবত্ব বিশ্লেষিত হয়েছে কখনও লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে, কখনো-বা চিত্রা কিংবা গীতার প্রেক্ষণবিন্দু থেকে — তাদের আত্মকথনে। মৌলি নিজেই কখনো নিজের দীর্ণ-জীর্ণ যন্ত্রণাময় সত্তার অভিজ্ঞানের স্বরূপ উন্মোচন করে দিয়েছে পাঠকের কাছে। মৌলির কবিতাপ্রিয়তা, প্রগাঢ় বিচ্ছিন্নতাবোধ, নৈঃসঙ্গ্য চেতনা, আত্মদ্বন্দ্ব, আটপৌরে একজন হওয়ার প্রগাঢ় বাসনা, বাসনার অচরিতার্থতাজাত বেদনাবোধ, শিল্পের প্রতি একাগ্রতা এবং তীব্র অহমবোধের অনুপুঙ্খ রূপায়ণ ঘটেছে এ উপন্যাসে। তার অবচেতনের নিমগ্ন সত্তাকে গোপিকানাথ অভিহিত করেছেন এক নিঃসীম অন্ধকার রহস্য-গভীর ব্যক্তিসত্তা হিসেবে — যার নির্জনতম প্রকোষ্ঠে, স্প্লিট পারসোনালিটির (spilt personality) বিদীর্ণ, বিচ্ছিন্ন নানা অবয়ব খেলা করেছে গোপনে। 'বুদ্ধদেব তার উপন্যাসে প্রধানত আধুনিক মানুষের বোধের, বিশ্বাসের সংকট এবং উপায়হীন বিষাদ ও বিমূঢ় বিপন্নতার কথাকে শিল্পিত করেছেন। নামে, অবয়বে ভিন্ন হলেও স্বভাবে-অনুভবে, চলনে-বলনে, কাজে ও পেশায় তাঁর নায়কেরা প্রায় অভিন্ন। এই অভিন্নতা বুদ্ধদেবের স্বকীয়তাও' (চৌধুরী, ২০১০ : ২৪৭)। অন্যদিকে মৌলি চরিত্র নির্মাণে লেখক আত্মজৈবনিক অনুষঙ্গ ব্যবহার করেছেন। মৌলিই মূলত বুদ্ধদেব বসুর কবিচেতনার ধারক। লোথার লুৎসে ও অলোকরঞ্জন দাশগুপ্তকে দেয়া এক সাক্ষাৎকারে মৌলি প্রসঙ্গে বুদ্ধদেব বসু বলেছেন :

> আমিই হতে পারতাম সে; না হলেও আমি মনে করিনা যে, তাকে ডিঙিয়ে গিয়ে কোনোকিছু বিশ্বাসযোগ্য কাজ আমি করতে পারতাম। আর আমি মনে করি, সেটাই হলো, ... কীটস যাকে বলেছেন negative capability। (বসু, ১৯৮৫ : ৩৬)

উপন্যাসের নানা ক্ষেত্রে লেখকের আত্মজৈবনিক উপাদান ছড়িয়ে আছে। এদিক থেকে এ উপন্যাসকে bildungsroman বা আত্মগঠনমূলক formative novel বলতে পারি। অন্তর্জীবনাভিজ্ঞতার ঘাত-প্রতিঘাতে বিবর্তমান সত্তার স্বরূপ উন্মোচন এধরনের উপন্যাসের মূল রীতি। তরুণ মৌলির বহু স্মৃতিবিজড়িত পুরানা পল্টনের যে রূপচিত্র এ উপন্যাসে আমরা পাই — তা *হঠাৎ আলোর ঝলকানি* প্রবন্ধগ্রন্থের 'পুরানা পল্টন' শীর্ষক প্রবন্ধেও তার বর্ণনা দিয়েছেন বুদ্ধদেব। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

> পুরানা পল্টনের টিনের বাড়িতে আমি ছ-বছর কাটিয়েছি। সমস্ত কলেজ-জীবন, সাহিত্য জীবনের প্রথম পর্যায়, যৌবনের উন্মেষ থেকে বিকাশ। এ সময়টা অত্মপ্রকাশের না হলেও আত্মপ্রস্তুতির দিক থেকে জীবনের সবচেয়ে প্রধান অংশ (বসু, ১৯৮২ : ৪২০)।

বুদ্ধদেবের মতো মৌলিরও কবি হয়ে ওঠার প্রস্তুতিপর্ব সমাধা হয়েছে সদ্য শহর হয়ে উঠতে থাকা পুরানা পল্টনে। লেখকের কবিসত্তার আর্তি ও আকুতির প্রগাঢ় প্রভাব লক্ষ করা যাবে মৌলি চরিত্রে। বুদ্ধদেব বসু রিলকে পড়েছেন, অনুবাদ করেছেন তাঁর কবিতা এবং অনুভব করেছেন রিলকের কবিপ্রাণের আক্ষেপ-বেদনা। নিজের ভেতরও বুদ্ধদেব কখনও শিল্প রচনায় ব্যর্থতার আক্ষেপে হয়ে উঠেছেন বেদনার্ত। এ উপন্যাসে বুদ্ধদেবের সেই বেদনা আরোপিত হয়েছে মৌলি চরিত্রে। উদাহরণ দেয়া যাক :

ক. রিলকের চিঠি :

> আমি এক নিঃস্রোত জলার মধ্যে এসে পড়েছি। ... আমি কি লেখা ছেড়ে দেবো। ... আমার ভিতরকার এই অনাবৃষ্টি সত্ত্বেও, চেষ্টা ছাড়বো না, ধরে নেবো যে আমি যার কাছে সীমাহীনভাবে অঙ্গীকৃত, এখন পর্যন্ত তার আরম্ভও হয়নি? এমন অনেক মাস কেটে যায়, যখন চরম পরিশ্রম করে আমি প্রসব করি কোনো নির্জীব চিঠির পাঁচটি পঙক্তি মাত্র — আর তাও এমন এক অক্ষমতার উত্তর স্বাদ রেখে যায়, যেন কোনো পক্ষাঘাতগ্রস্ত রোগী আর হাতটিও তুলতে পারছে না। (বসু, ১৯৭০ : ৪১-৪২)

১৯৭০ সনে কনিষ্ঠা কন্যাকে লেখা একটি চিঠিতে মেলে রিলকের মতোই বুদ্ধদেব বসুর প্রগাঢ় হতাশা :

> কত সময় আমার শূন্য মনে হয় নিজেকে, যেন কিছুই ভাবতে পারছি না, একটা কথাও আর মাথায় খেলছে না — তবু মাথা খুঁড়ে খুঁড়ে কিছু একটা বের করেছি, ধরতে চেয়েছি, সাহস করে শুরু করে দিয়েছি, প্রতিটি শব্দ, প্রতিটি বাক্য নিয়ে যুদ্ধ করে করে এগিয়েছি — আমার সেই কষ্টের কথা বলার নয়। (বসু, গ্রন্থ-প্রকাশকাল অনুল্লেখিত : ১৮৩)

মৌলিনাথ উপন্যাসে উপর্যুক্ত বাক্যগুলোই যেন নতুন করে লেখা হল। সাতাশ বছরের মৌলি জীবনবাস্তবতা-রহিত শিল্পচর্চা করতে গিয়ে মাথা ঠুকে হয়েছে রক্তাক্ত। ঊষর ব্যক্তিসত্তার প্রতীক মৌলির হাহাকার তাই ধ্বনিত হয় তার আত্মকথনে :

> ... এই নিঃশব্দ দুপুর বেলায় কলম হাতে বসে বসে একটু অন্যরকম মনে হচ্ছিলো মৌলিনাথের। ... এই যে সে থেমে গেছে — স্রেফ থেমে গেছে — তাছাড়া অন্য কোনো ভাষা নেই এর। সুর থেমে গেছে মনের মধ্যে, কোথাও কোনো স্পন্দন নেই, যেন কোনো নিথর হিম হঠাৎ নেমেছে তার মনের উপর, যেন মৃত্যুর হাত ধরে ফেলেছে তাকে — নাকি কারো প্রতিহিংসা, নাকি অলক্ষ্যে তাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে ক্ষমাহীন কোনো অভিশাপ? ...দু-এক বছরের মধ্যে কয়েকবারই হলো থেকে থেকে যেন কোনো নেপথ্যে চলা চক্রান্তের ফলে হঠাৎ রুদ্ধ হয়ে যায় তার সমস্ত কিছু চিন্তার আর অনুভূতির উৎস ... যা কিছু সে ভাবে, সব যেন তার স্পর্শমাত্র ঝরে পড়ে যায়। ... মৌলির যেন দম আটকে এল ...। (বসু, ১৩৯১ : ২১০)

রিলকে বুদ্ধদেব কিংবা মৌলি একইভাবে নৈঃসঙ্গ্য ও সৃজনের যন্ত্রণাকে চেতনায় বহন করেছেন। মৌলির কবি-সত্তা নির্মাণে তাই রিলকে-বোদলেয়ার-বুদ্ধদেবের প্রভাব গভীর। তবু বলা যেতে পারে বুদ্ধদেব বসু মৌলির প্রোটোটাইপ নন। বুদ্ধদেব নিজেই লিখেছেন :

> বাইরের দিক থেকে আমি তো একেবারেই মৌলির মতো নই। নিজের শিল্পের জন্য ছেড়েছি কিছু, কিন্তু জীবনের মধুও তো পান করেছি অনেক। তবু তার জীবাণু রয়েছে আমার মধ্যে...। (বসু, ১৯৮৫ : ৩৬)

একাকিত্বের মধ্যে বাস করেও অনেকের সংসর্গ পেতে চেয়েছেন বুদ্ধদেব। এখানেই রিলকে এবং মৌলির সঙ্গে তাঁর স্বাতন্ত্র্য। 'একাকিত্বের শুদ্ধতা বা সততা' সম্পর্কে রিলকে যেখানে একতিল ছাড় দিতে নারাজ সেখানে বুদ্ধদেব ওই একটা জায়গায় রিলকের কাছ থেকে কোথায় যেন স্বতন্ত্র থাকতে চান। আত্মিক সংযোগ বজায় রেখেই বা না রেখেও তিনি ভিতরে ভিতরে একা থাকতে চেয়েছেন সর্বতোভাবে।

বুদ্ধদেবের এই আত্মদর্শনের মধ্য দিয়েই মৌলিনাথ চরিত্র সম্পূর্ণ হয়ে উঠেছে।

উপন্যাসে মৌলিকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হয়েছে আরো দুটি চরিত্র চিত্রা এবং গীতা। মৌলির আত্মভাষ্য বা মনোকথনে এ চরিত্রগুলোর বৈশিষ্ট্য রূপ পেয়েছে। মৌলির প্রতি চিত্রার প্রগাঢ় অনুরাগ ও তার বাস্তববুদ্ধি এবং গীতার অনভিজ্ঞ জীবন থেকে প্রাজ্ঞ জীবনে উপনীত হবার মধ্য দিয়ে চরিত্র দুটি উপন্যাসে পূর্ণতা পেয়েছে। বুদ্ধদেব বসু বলেছেন :

> মৌলিনাথে আমি এমন একজন মানুষকে দেখাতে চেষ্টা করেছিলাম যে সারাজীবন ধরে, অজস্র মূল্য দিয়ে নিজেকে উৎসর্গ করে, কঠোর চেষ্টা করেছে একজন পরিপূর্ণ শিল্পী হয়ে উঠতে। ...সে মানুষ দিনের পর দিন, সপ্তাহের পর সপ্তাহ, বছরের পর বছর নিজেকে বন্দী করে রেখেছে নিজের পড়াশোনায়, ফিরিয়ে দিয়েছে মেয়েটিকে — আসলে দুজন মেয়ে — যারা তীব্রভাবে তাকে ভালোবাসতো। ...এ হল প্রতিক্রিয়া, একজন মানুষের স্বাভাবিক প্রতিক্রিয়া, যে মানুষ প্রকৃতির বিরুদ্ধে গিয়ে বেঁচে থাকার জন্য সারাজীবন চেষ্টা করেছে। (বসু, ১৯৮৫ : ৩৬)

মৌলি, চিত্রা এবং গীতা — এই তিনটি অন্তর্মুখী চরিত্রই *মৌলিনাথ* উপন্যাসের প্রাণ।

সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত মৌলিনাথ উপন্যাসে লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির সঙ্গে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণও ব্যবহৃত হয়েছে। গোপিকানাথ মন্তব্য করেছেন :

> সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণকে একটু সীমিত করে এভাবে ব্যক্তিবিশেষের (যাকে বলা হয় third person singular-এর) দৃষ্টিকোণ থেকে বিভিন্ন ঘটনা ও চরিত্রকে দেখানোর সাহায্যে উপন্যাসের মনস্তাত্ত্বিক বাস্তবতা দান করাই এর উদ্দেশ্য। (চৌধুরী, ১৯৮৪ : ২৫)

মৌলি বুদ্ধদেব বসুর প্রাণসত্তার ধারক বলেই এ উপন্যাসে মৌলির উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ মূলত লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণেরই সীমায়িত মাত্রা।

মৌলির আঁতের কথা বের করে দেখানোই ছিল লেখকের মূল উদ্দেশ্য। এ কারণেই মৌলির ক্রমরূপান্তরিত অন্তঃসত্তার কান্না, আকাঙ্ক্ষা, কাম, প্রণয় ও দ্বন্দ্বের স্বরূপ বিশ্লেষণে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহার অনিবার্য ছিল। উদাহরণ :

> সাতাশ বছর; এক-এক সময় শুধু এই চিন্তাই পাথর হয়ে চেপে বসে তার বুকের উপর যে, বয়স তার সাতাশ হলো। ... ইতিমধ্যেই সাতাশ! কী দারুণ বার্ধক্যের মতো এই সাতাশ। জীবনের পূর্ণকাল কি ইতিমধ্যেই কাটায়নি সে? সমাপ্তির প্রান্তে এসে কি পৌঁছায়নি? অভিজ্ঞতার দীর্ঘ পথ পার হয়ে কি আসেনি — মানুষের মহিমা, মানুষের ইন্দ্রিয়বন্দী অসহায় তুচ্ছতা, সব কি উপলব্ধি করেনি নিজের মধ্যে, জানেনি আনন্দ, হৃদয়প্লাবী আহ্লাদ — জানেনি তৃষ্ণা, বুক ফাটা তৃষ্ণায় জলের দিকে ছুটে ছুটে বালুর মধ্যে মুখ থুবড়ে জ্বলে মরা, তাও কি সে জানেনি? (বসু, ১৩৯১ : ১৭২)।

উপন্যাসের প্রারম্ভে জায়মান পুরানা পল্টনের বর্ণনায়, মৌলির কৈশোরোত্তীর্ণ বহিরঙ্গ ও অন্তর্মানসের স্বরূপ উন্মোচন, এমনকি চিত্রা ও মৌলির পারস্পরিক কথোপকথনে, অনুরাগ চিত্রণে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। দ্বিতীয় খণ্ডে গীতা ও মৌলির পারস্পরিক কথোপকথন উপস্থাপনেও ব্যবহৃত হয়েছে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ । কিন্তু তৃতীয় খণ্ডের শুরুতে উপস্থাপিত মৌলির লিবিডোভারাতুর মনের অবদমনে সৃষ্ট স্বপ্নের

বর্ণনায় উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। স্বপ্নশেষে অবশ্য ফিরে এসেছে লেখকের সর্বজ্ঞ দৃষ্টিকোণ। দৃষ্টিকোণ ব্যবহারে এই ক্রম পরিবর্তনকে ই.এম. ফর্স্টার 'shifting view' বলে আখ্যায়িত করেছেন। Lubbok-এর *The Craft of Fiction*-এ ব্যবহৃত বিবিধ দৃষ্টিকোণ সম্পর্কে E. M. Forster লিখেছেন :

> The novelist.. can either describe the character from outside, as an impartial or partial onlook; or he can assume omniscience and describe them within; or he can place himself in the position of one of them. (Forster, 1988 : 81)

উপসংহার খণ্ডের চিঠিতেও ব্যবহৃত হয়েছে উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ। এ উপন্যাসে আত্মকথন রীতিতেই মূলত উত্তম পুরুষের দৃষ্টিকোণ ব্যবহৃত হয়েছে। *মৌলিনাথ* উপন্যাস রচিত হয়েছে 'shifting view'-এর মাধ্যমে।

উপন্যাসের ভাষা মৌলির ব্যক্তি-অনুভূতির রঙে গীতল ও কবিতাক্রান্ত। ইঙ্গিতময়তা এবং প্রতীকধর্মিতায় এর ভাষা প্রগাঢ়ভাবে ব্যঞ্জনাময়। David Lodge লিখেছেন :

> Such writers seek a radical transformation of conventional forms of communication, through which to express poetically on inner crisis of sensibility (Lodge, 1967 : 244).

এ ধরনের মনস্তাত্ত্বিক উপন্যাসে অন্তঃসত্তার গীতল প্রকাশ গদ্যভাষাকে কবিতাক্রান্ত করে তোলে।

চলিত ভাষায় লেখা এ উপন্যাসের গদ্যশৈলীর মূল অভিনবত্ব এর গতিময় কাব্যিক ভাষা। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বুদ্ধদেব বসুর *বাসরঘর* উপন্যাস পড়ে তার ভাষা সম্পর্কে মন্তব্য করেছিলেন :

> ... এ কবির লেখা গল্প, আখ্যানকে উপেক্ষা করে বাণীর স্রোত বেগে বয়ে চলেছে (ঠাকুর, ১৯৭৬ : ৫৮৪)।

উপমা-রূপক-প্রতীক-চিত্রকল্পের বহুল ব্যবহার ভাষাকে অহেতুক ভারাতুর করে তোলেনি। নিরঞ্জন চক্রবর্তী বুদ্ধদেবের ভাষা-ব্যবহার প্রবণতা প্রসঙ্গে লিখেছেন :

> বুদ্ধদেব কি রকম ভাষায় লিখতে চান, তার পরিচয় তিনি নিজ মুখেই দিয়েছেন। তিনি স্বয়ং সরস্বতীকে বলেছিলেন, 'দেবী! ভাষা এত দুর্বল কেন? ভাষার সেই রহস্য আমাকে বলো যাতে তা দীপ্ত কৃপাণ হয়ে ওঠে, প্রবল বন্যা হয়ে ওঠে দুরন্ত বহ্নিশিখা।'... বুদ্ধদেবের ভাষার স্পষ্ট গুণ তার গতি ও প্রাণ। (চক্রবর্তী, ১৯৭৮ : ৬৪৯)

মৌলিনাথ উপন্যাসের ভাষাও গতিময়, প্রাঞ্জল ও আবেগময়। এই আবেগময়তা প্রকাশ করতে গিয়ে লেখক দীর্ঘ-পল্লবিত বাক্য ব্যবহার করেছেন :

> ক. তাপ উঠছে মাটির বুক থেকে, সূক্ষ্ম তাপ, তাতে ক্লেশ নেই, তীব্রতার সূচিমুখের প্রথম সুখকর স্পর্শটুকু মাত্র, যে-স্পর্শ হাওয়াতেও এখনো লাগেনি — সেই হাওয়া, যে ভুলতে

পারেনি হয়ে যাওয়া বৃষ্টিকে অথচ আজকের উজ্জ্বলতাকেও মেনে নিয়েছে — শুধু মেনে নিয়েছে তাও নয়, তাকে স্নিগ্ধ করে তুলছে কালকের স্মৃতিকণার মৃদুতা ভরে ছড়িয়ে দিয়ে (বসু, ১৩৯১ : ১৩৯)।

খ. শিল্পীরা তীব্র করে বাঁচেন, চরম করে বাঁচেন — এ-কথাই মৌলি ভেবেছে এতদিন — বাঁচার পেয়ালা পূর্ণ হ'য়ে যা উপচে পড়ে সে-ই তাঁদের সৃষ্টি। শুধু বেঁচে থেকে বাঁচার ধার মেটে না তাঁদের — হাজার মানুষের সমান জীবন্ত কোনো শেক্সপিয়র, বিশাল কোনো বীণার মতো দুরন্ত কোনো রবীন্দ্রনাথের (বসু, ১৩৯১ : ১৭৩)।

গ. চিত্রাই কথা বলল আবার, একটু ক্ষীণ স্বরে; ... কোনো মিনারের গম্বুজের মতো উঁচু দেখালো ক্ষীণ তনুটির উপর তার পর্যাপ্ত খোঁপা; তার ডিমের ছাঁদের মুখ — ম্লান রঙের — মৌলির ভাষায় বতিচেলি মুখ — সেই মুখের পরিষ্কার একটি প্রোফিল এঁকে দিলো (বসু, ১৩৯১ : ১৪৭)।

কমা, সেমিকোলন এবং ড্যাস ব্যবহার করে একটি বাক্যের সঙ্গে অন্য একটি বাক্য যুক্ত করে মনোভাব কিংবা আবেগকে পল্লবিত করে তোলা হয়েছে। তবে কখনো কখনো এই আবেগ বল্গাহীন হয়ে উঠেছে। আবেগকে পল্লবিত করার এই প্রবণতা ইংরেজি বাক্য গঠনে বেশ চোখে পড়ে। বুদ্ধদেবের ভাষায় এই ইংরেজি বাক্যসুলভ গঠনকাঠামো বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের মন্তব্য স্মরণযোগ্য।

শব্দব্যবহারের ক্ষেত্রে তৎসম শব্দের সঙ্গে ইংরেজি শব্দও ব্যবহৃত হয়েছে *মৌলিনাথ* উপন্যাসে। তাছাড়া বিশেষণের ব্যবহারও বেশ প্রবল। মাঝে মাঝে গুচ্ছ-বিশেষণের ভারে মূল বাক্যের সৌন্দর্য চাপা পড়ে গেছে। তবু জেমস জয়েসের মতো অভিনব বিশেষণ ব্যবহারে এ উপন্যাস স্বতন্ত্র :

ক. আশ্চর্য, অপরূপ, অলৌকিক-শূন্য দিয়ে গড়া এই রঙ্গমঞ্চ। (বসু, ১৩৯১ : ১৬৯)
খ. তথ্যকীট-কমা-জ্ঞানী মহেন্দ্র ঘোষ অক্ষরের মূর্তিপূজক। সাহিত্যের উৎকুনভুক রসরক্তহীন পতঙ্গ। (বসু, ১৩৯১ : ১৫২)
গ. মুখের ভাবটি নিষ্পাপ, স্বার্থপর, কূটচক্রী, সরল, পবিত্র, অথচ স্পৃষ্ট, উচ্ছিষ্ট, হটকারী, যেন অবিচারে অপ্রতিরোধ্যতার প্রবণতা। (বসু, ১৩৯১ : ১৪২)

উদ্ধৃতি গ-তে মৌলির মৌলিক প্রবণতা বর্ণনায় লেখক একই সঙ্গে প্রগাঢ় দ্বন্দ্বমূলক বিশেষণ ব্যবহার করেছেন। এগুলো তার প্রাণের বৈশিষ্ট্যকেই ধারণ করেছে।

অলংকার প্রয়োগের ক্ষেত্রে এ উপন্যাসে বেশি ব্যবহৃত হয়েছে উপমাবাহিত চিত্র ও চিত্রকল্প এবং প্রতীক। কয়েকটি উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

উপমা

ক. ঐ দূরে, রেল লাইনের ওপারে শহুরে চিল কোঠার উপর আকাশ যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে — সেখানে আকাশ নির্মেঘ নিরঞ্জন, ... ডিমের খোলার মতো নির্বিকার রঙের — কোমল স্বচ্ছ, স্পর্শাতীত,পবিত্র– অস্পৃষ্ট ঋষ্যশৃঙ্গের চোখে বারাঙ্গণার উদ্ঘাটিত উরুর মতো অপাপবিদ্ধ (বসু, ১৩৯১ : ১৬৯)।
খ. কোথা থেকে নিয়ে এল ঐ বাহু, অপ্সরীর মতো উজ্জ্বল, রাশি রাশি ফুলের মতো স্পর্শময় অথচ যেন স্পর্শহীন, স্পর্শের অতীত। (বসু, ১৩৯১ : ২০১)

উৎপ্রেক্ষা

ক. নরম,কম মিষ্টি, একটু ভেজা-ভেজা মিহিন সন্দেশ জিভের উপর গলে গেলো যেন সুইনবর্নের কোনো শুভ্র সিলেবল...। (বসু, ১৩৯১: ১৫৫)

খ. বটগাছের জটিল দেহটি দুলে উঠল যেন নমুদ্রির মতো নাচের ভঙ্গিতে। (বসু, ১৩৯১: ১৭৭)

গ. চাঁপার গন্ধ যেন লুকিয়ে থাকা বাঘের মতো লাফিয়ে পড়লো তার উপর। (বসু, ১৩৯১ : ১৪৩)

সমাসোক্তি

ক. ঐ বুঝি উড়াল দিলো আষাঢ়, ঝাঁপ দিলো বৃষ্টি, সারা আকাশ বাংলা ভাষায় কথা কয়ে উঠলো। (বসু, ১৩৯১ : ১৭৭)।

খ. সেই হাওয়া, যে ভুলতে পারেনি হয়ে যাওয়া বৃষ্টিকে অথচ আজকের উজ্জ্বলতাকেও মেনে নিয়েছে। (বসু, ১৩৯১ : ১৩৯)

গ. চাঁপার ধারালো গন্ধ আঘাত করলো তাকে, রৌদ্রজ্বলা নীল হাওয়া ঝলমল করলো চোখের সামনে। (বসু, ১৩৯১ : ১৪৫)

চিত্রকল্প

ক. মেঘ নেই, একফোঁটা শাদা মেঘও লেগে নেই কোথাও; নগ্ন বিশাল উন্মুক্ত আকাশ থেকে রৌদ্র ঝরছে অপরিমাণ আবেগে, যেন সূর্যদেব তার শাশ্বত পিতৃত্ব ভুলে প্রেমিকের রূপে দেখা দিয়েছেন, তার অজর তারুণ্যের তেজে প্লাবিত করে দিচ্ছেন তার কন্যা এই পৃথিবীকেই। (বসু, ১৩৯১ : ১৩৯)

খ. ... মেঘেদের নড়াচড়া মন্থর ধ্রুপদী তালে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে পরস্পরে মিশে যাওয়া, কোনো এক অতুর অধৈর্যহীন, পরিবর্তমান স্থাপত্য বিলাস — মিনার, খিলান, সোপান, গম্বুজ, বারান্দার পর অফুরন্ত বারান্দার ভাঙা গড়া; তারপর তাকিয়ে থাকতে-থাকতেই, সব ভেঙে গেলো, মুছে গেলো, একাকার হলো কালোয়; স্তব্ধ হলো গতি, হাওয়া বন্ধ, কম আলোয় আরো বিস্তীর্ণ দেখালো প্রান্তরের উপর, ছবির মতো নিস্পন্দ — হওয়া বটগাছটার উপর, সমস্ত রুদ্ধশ্বাস প্রতীক্ষমাণ পৃথিবীর উপর, মেঘ তার জটায়ু-পাখা আদিগন্ত ছড়িয়ে দিয়ে পড়ে থাকলো। (বসু, ১৩৯১ : ১৭০)

গ. ইট বের করা দেয়ালটায় অনড় হয়ে রোদ পড়েছে — রোদ! কত আকাশ ভেসে যাচ্ছে এই পড়ন্ত সোনালী আলোয়! আর তার ঘরে? আলো কম, শীত — বিশ্রী শীত — ঠাণ্ডা কালো, মৃত — মৃত এই ঘর তার, মৃত সে নিজে...। (বসু, ১৩৯১ : ২১৬)

ভাষায় উপমা, উপমাবাহিত চিত্রকল্প, উৎপ্রেক্ষা ও প্রতীকের এমন কারুকাজ লেখকের ভাষাকে গীতল করে তুলেছে। তবে কোথাও কোথাও অলংকার ব্যবহারে অসংযম লক্ষণীয়।

শুধু অলংকার ব্যবহারেই এ উপন্যাসের ভাষারীতি পূর্ণতা পায়নি, আত্মকথনরীতি এবং চেতনাপ্রবাহরীতির মিথস্ক্রিয়ায় রচিত হয়েছে এ উপন্যাসের ভাষা। কোনো কোনো সমালোচক বুদ্ধদেব বসুর গদ্যশৈলীতে জেমস জয়েস এবং ভার্জিনিয়া উলফের চেতনাস্রোত এবং আত্মকথনরীতির প্রকাশ দেখেছেন। তবে 'বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসের মধ্যে জটিলতা নেই, আছে স্বচ্ছতা ও কবিত্ব যা চৈতন্যস্রোত এবং স্মৃতিচারণার বাহন'। (সেন, ২০০৮ : ৯৪)

উপন্যাসের চরিত্রগুলো পারস্পরিক কথোপকথনের তুলনায় খুব বেশি মাত্রায় আত্মকথনরত। তৃতীয় খণ্ডের শেষ অংশে কবিতা-দয়িতের ভারগ্রস্ত মৌলি আত্মদ্বন্দ্বের টানাপড়েনে নিমজ্জিত হয়েছে আত্মকথনে :

আ, চিত্রা কেন তুমি আমাকে ভর্তি ক'রে নাওনি তোমার ইস্কুলে — জীবনের সেই আদিবিদ্যার মণ্ডপে, যেখানে কাঁচা পেয়ারা গাড়িতে বসে আরো ভালো লাগে। আর সেই গাড়ি থামলে দরজা খুলে দেয় কপালে চুল লুটিয়ে পড়া ছোট ছেলে!...আমি কি এমন করেই পালিয়েছিলাম যে কেউ আর ফিরে ডাকলো না আমাকে! গীতা, তুমি! কিন্তু কেন তুমি কবিতা পড়লে গীতা ...! বোন হয়ে এলে কেন আমার কাছে? ডাকলে যদি আমারই গলায় ডাকলে কেন!... (বসু, ১৩৯১ : ২৩২)

মৌলির কাছে গীতার এই বোনসত্তা শেলীর soul sister-এর কথাই মনে করিয়ে দেয়। প্রথম খণ্ডে বেশ কয়েকবার মৌলি আত্মকথনে রত হয়েছে। চিত্রা ও মহেন্দ্রবাবুর বিয়ের বিষয়টি বেশ পাগলামির ভেতর পড়ে — মৌলির একথা শোনার পর চিত্রা অস্থিরভাবে তার দিকে তাকিয়ে থাকে। মনে মনে বলে :

দ্যাখো দ্যাখো একে! দ্যাখো এই লোকটার দিকে তাকিয়ে! নির্বোধ, এখনো নির্বোধ থাকবে তুমি — আমাকে বাধ্য করবে আরো বলতে, টুকরো করে ফুল ছিঁড়তে — সাধারণ সুখ সইতে পারে না যে মানুষ , তার প্রচণ্ড দুর্বলতাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে যতক্ষণ না গিয়েছি ততক্ষণ ছাড়বে না আমাকে, আমাকে পায়ের তলায় মাড়িয়ে না গিয়ে ছাড়বে না, নিষ্ঠুর? (বসু, ১৩৯১ : ১৬৪)

কিংবা মৌলির প্রতি গীতার অন্তঃকথন :

তুমি আমাকে ছোটো দেখেছো, এমন একটা সময় থেকে আমাকে দেখেছো যখন, আমি প্রায় শিশুদের দলে আর তুমি অকালপক্ব। ... সেই বয়সে সেই সবচেয়ে কাঁচা এবং আগ্রহে ভরা বয়স থেকে তোমাকে যদি না দেখতাম — তুমি এমন আশ্চর্য সজীব আর এমন উদাসীন...। (বসু, ১৩৯১ : ১৮৩)

এ উপন্যাসের তিনটি চরিত্রই স্বগতোক্তির মধ্য দিয়ে নিজের কাছে নিজে বোঝাপড়া করেছে। এভাবেই চরিত্রের অন্তঃসংলাপ এবং তাদের পারস্পরিক কথোপকথনের মিথস্ক্রিয়ায় এ উপন্যাসের ভাষারীতি নির্মিত হয়েছে ।

মৌলিনাথ উপন্যাসে নাটকীয় পরিচর্যারীতির তুলনায় কাব্যিক-দৃশ্যাত্মক-প্রতীকী এবং বর্ণনাত্মক পরিচর্যারীতির প্রাবল্য রয়েছে। একজন কবির রচিত উপন্যাসে আরেকজন কবির অন্তর্জগতের অন্তর্ভাষ্য রচিত হয়েছে বলে পুরো উপন্যাস জুড়েই কাব্যিক পরিচর্যারীতির প্রবলতা উপলব্ধি করা যাবে। এ উপন্যাসের বর্ণনাত্মক পরিচর্যারীতি নিছক বর্ণনাতেই সীমাবদ্ধ থাকেনি, বর্ণনায় যুক্ত হয়েছে ইঙ্গিতময়তা। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে;

বর্ণনাত্মক পরিচর্যারীতি :

আরো অনেক বাড়ি উঠেছে পাড়ায় : দোতলা বাড়ি, জাঁকালো বাড়ি, বাগানওয়ালা বাড়ি, পরদা ঘেরা, মার্বেল পিতলের নামের ফলকে চকচকে আত্মসচেতন।...যখন শহর থেকে শাঁখারি বাজার, তাঁতি বাজার, ইসলামপুরের মিষ্টি স্যাঁৎ সেঁতে পচা-পচা নেশা ধরানো গন্ধে-ভরা পুরনো দিনের ঢাকা থেকে কেউ আসে সেখানে — টাটকা চুনকাম করা দেয়াল — কেননা অধিকাংশ বাড়ি নতুন, আর তেমন পুরোনো কোনোটাই এখনো নয়, সদ্য সবুজ খড়খড়ি, ক্রেটোন কাপড়ের পরদার ফাঁকে ধূসর শীতল মসৃণ মেঝের পরিচ্ছন্ন আভাস; — সব মিলিয়ে নতুন;... (বসু, ১৩৯১ : ১৬৮)

এই বর্ণনায় ঝা-চকচকে নতুন বাড়ির পাশে মৌলির নামগোত্রহীন মলিন একতলা বাড়িটি যেন মৌলিরই প্রতীক।

দৃশ্যাত্মক পরিচর্যারীতি :

তাকিয়ে তাকিয়ে মৌলি দেখছিলো, কেমন বিশাল, কেমন সীমান্তহীন, বিস্ফারিত হয়ে নেমে আসছে আষাঢ়ের সন্ধ্যা। মেঘের উপর মেঘ জমেছে আকাশে, রঙের উপর রঙ লেগেছে; ... শাদা মেঘের উপর ধোঁয়া মেঘ, ধোঁয়ার উপর নীল, নীলের উপর কালো।...ঐ দূরে রেললাইনের ওপারে শহুরে চিল-কোঠার উপর আকাশ যেখানে ঢালু হয়ে নেমেছে — কিংবা যেখানে তার উত্থানের আরম্ভ — সেখানে আকাশ নির্মেঘ নিরঞ্জন ... বেঁকে বেঁকে উঠেছে ছাই রং, ছাই রং, ধূসর; (বসু, ১৩৯১ : ১৬৯)।

দৃশ্যাত্মক পরিচর্যারীতির সঙ্গে চিত্রল ভাষার মিশেলে উপর্যুক্ত বর্ণনা চমৎকৃতি পেয়েছে।

কাব্যিক পরিচর্যারীতি :

যে কবিতা তার মনে পড়েছে আজ, ... তাও ঠিক মিলে গেছে আশেপাশের সমস্ত কিছুর সঙ্গে, যেন গলে যাচ্ছে — মুখ থেকে বেরুনোমাত্র গলে যাচ্ছে হাওয়ায়, সোনালি-সবুজ সুন্দর...এই বৈশাখের সকালবেলায়।...কোনো এক সম্ভবপর কবির মুখে নিঃসৃত হচ্ছে সুইনবর্ণ — কবিদের মধ্যে দানবিক ছেলেমানুষ; চিরকুমার,কামাতুর — টেবিলের ওপর খোলা আছে এই কবির কাব্য — আর তার পাশেই, যেন এই কবিতার সমস্ত তিক্ত মাধুরীতে মূর্ত করে,এই উন্নয়মান সূর্যের বন্যাকে সংহত, সুস্মিত এবং ইন্দ্রিয়শোভন করে, পড়ে আছে সাদা পাথরের থালায় কয়েকটি রোদ্দুর রঙের চাঁপা, মাংসল, উদ্ধত, ...নির্লজ্জ স্পর্শে নির্ভয়, রৌদ্রের নিবিড় — চুম্বিত ঘ্রাণভাণ্ডার। (বসু, ১৩৯১ : ১৪৩)

কবিতার মতোই ছন্দোময় এই গদ্যের গঠন। বহির্জগতের রঙ-আলো-ছায়া, চিন্তা শব্দ একাকার হয়ে চমৎকার এক কাব্যিক রসায়নের জন্ম হয়েছে এখানে।

প্রতীকী পরিচর্যারীতি :

এ উপন্যাসে প্রতীকী পরিচর্যারীতি ব্যবহারে দক্ষতার পরিচয় দিয়েছেন বুদ্ধদেব। *নীল রঙের* মধ্য দিয়ে লেখক এখানে চমৎকার কুশলতায় প্রতীকায়িত করেছেন চিত্রাকে — চিত্রার অপসৃত সত্তাকে। কখনও চিত্রার শাড়ির রঙে, কখনও বা পর্দার রঙে নীল রং ফিরে ফিরে এসেছে উপন্যাসে। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

ক. গাড়ি যখন মোড় নিচ্ছে ঠিক তখনই চকিত নিশ্চিত একটিমাত্র মুহূর্তে সে দেখে নিয়েছে এক টুকরো নীল, নীলের প্রতিজ্ঞাবহ আভা, হাঁটুর উপর শাড়ির ভাঁজের মিলিয়ে-যাওয়া নির্ভুল নীলিমা — আর তারপর তার দ্রুত-হওয়া হৃৎপিণ্ড অন্যসব কথা তাকে বলে দিয়েছে। নীল, আকাশ-নীল, হালকা-নীল, স্বপ্ন-নীল। চিত্রা পরে ব'লেই ঐ রং তার ভালো লাগে? নাকি তার ভালো লাগে বলেই চিত্রা পড়ে? (বসু, ১৩৯১ : ১৪৪)।

খ. ভূতুড়ে, অদ্ভুত, গা ছমছম-করা সান্ধ্য বিদ্যুতের নীল সবুজ-সোনালী-শাদা পাগল আলোয় অস্থির বটগাছটা দেখা দিয়ে মিলিয়ে গেলো আবার, তারপর ভীষণ শব্দে বাজ পড়লো যেন আকাশটাকে চুরমার করে ফাটিয়ে দিয়ে।....মধুর শব্দে বৃষ্টি যেই ঝাঁপিয়ে নামলো, অমনি দ্রুত

নিঃশব্দ পায়ে ঘরে এলো একটি মেয়ে, ঘন নীল পরদাটাকে পিছনে রেখে দরজার ধারে দাঁড়ালো।....এই ঘরে, যেখানে এতক্ষণ ধরে সব ছিলো গম্ভীর, চিন্তায় এবং আষাঢ়ে ভারাতুর সাতাশ বছরের বার্ধক্য-বোধে আচ্ছন্ন, আত্মচেতনার কুয়োর মধ্যে খুঁড়ে খুঁড়ে তন্ন তন্ন তল্লাসের শ্রমে প্রপীড়িত — সেখানে হঠাৎ যেন আলোর জগতের ডাক এলো....গীতা (বসু, ১৩৯১ : ১৭৭)।

গ. মহিলাটি তাকিয়ে দেখলেন। সামনে পোড়ো জমি এক ফালি, খামকা একটা দেয়াল, ওপাশে বিবর্ণ একটা দোতলা।...আস্তে ঠেলা দিয়ে ভেতরে এলেন। হঠাৎ বুকের মধ্যে হৃৎপিণ্ড যেন থেমে গেলো, আর তার পরের মুহূর্তেই যেই চোখে পড়লো ডানদিকের দরজাটা ধোঁয়া লেগে লেগে কালো-দেখানো নীল রঙের পরদায় ঢাকা দরজা — আর পরদার ফাঁকে একজন চেয়ারে বসা মানুষের একটুখানি আভাস...ঐ ময়লা পরদাটার বাইরে দাঁড়িয়ে ষোল বছরের মেয়ের মতো কাঁপন লাগলো তার বুকের মধ্যে...। (বসু, ১৩৯১ : ২২১)

উদ্ধৃতি ক-তে 'নীলের প্রতিজ্ঞাবহ আভা' কিংবা নির্ভুল নীলিমা চিত্রার প্রতি মৌলির নির্ভুলতম প্রণয়াকাঙ্ক্ষাকেই ব্যক্ত করে। নীল রং-এর শাড়ি এখানে চিত্রার প্রতীক। উদ্ধৃতি খ-তে সান্ধ্য বিদ্যুতের নীল সবুজ সোনালী সাদা আলোকচ্ছটার পটভূমিতে নিভৃতে যে নারীকে মৌলির ঘরে প্রবেশ করতে দেখা যায় — সে গীতা। চিত্রা এখানে ঘন নীল পরদার প্রতীকে আভাসিত, যা ধীরে ধীরে অপসৃত হয়ে উঠেছে — আর গীতা হয়ে উঠেছে অস্তিত্ববান। তৃতীয় উদ্ধৃতিতে মৌলির মৃতপ্রায় জীবনে উত্তাপ নিয়ে ফিরে আসে চিত্রা। ধোঁয়া লেগে লেগে কালো দেখানো নীল পর্দা মৌলির অন্তঃসত্তার নখরে ক্ষতাক্ত এবং ক্রমে অপসৃয়মান চিত্রার স্মৃতিকেই প্রতীকায়িত করে। ধোঁয়াটে কালিতে অপসৃত চিত্রার স্মৃতির উপর পড়া পর্দা যেন সরে যাচ্ছে ধীরে; চিত্রা ফিরে আসছে আবার মৌলির জীবনে।

এভাবেই উপন্যাসে নীল রঙের মাধ্যমে চিত্রাকে চমৎকারভাবে প্রতীকায়িত করে তোলা হয়েছে।

উপন্যাসের আরেকটি প্রতীক বটগাছ। নবনির্মিত পুরানা পল্টনে অস্তিত্ববান বটগাছের প্রতীকে মৌলিসত্তাই প্রতীকায়িত। বিশ্বজিৎ ঘোষ লিখেছেন :

মৌলিনাথ উপন্যাসে পুরানা পল্টনের 'উন্নত প্রশস্ত বলীয়ান একটা বটগাছ'-এর চিত্র একাধিকবার ঘুরে ফিরে এসেছে, যে বটগাছ মৌলিনাথেরই স্বাতন্ত্র্যমণ্ডিত ব্যক্তিত্বের প্রতীক। নির্মীয়মাণ শহরের বুকে বিশাল বটগাছের একাকিত্ব মৌলিনাথের প্রাতিস্বিকতার রূপক ব্যঞ্জনা। বুদ্ধদেব বসু শৈল্পিক ব্যঞ্জনায় এই বটগাছের নিঃসঙ্গতার সঙ্গে মৌলিনাথের নৈঃসঙ্গ্যকে সমীকৃত করেছেন। বটগাছের দিগন্ত বিস্তার মৌলিনাথের কাছে আপন ব্যক্তিত্ব বিস্তারের অনুপ্রেরণা হয়ে দেখা দিয়েছে...। (ঘোষ, ১৯৯৭ : ২৩৪-৩৫)

এ উপন্যাসে মৌলি জীবনবিযুক্ত এক চরিত্র। তাঁর বিচ্ছিন্নতাজাত নৈঃসঙ্গ্য উপন্যাসে নানা অনুষঙ্গে প্রকাশিত। সাহিত্যে জীবন-বাস্তবতা রহিত এমন উদাসীন চরিত্রের দেখা মেলে। তবে মৌলির মায়ের মৃত্যুানুষঙ্গে মৌলির মনোভঙ্গি বিশেষ করে যেন দুটি চরিত্রকেই মনে করিয়ে দেয়। উদাহরণ দেয়া যেতে পারে :

মৌলির মনে পড়লো তার মা-কে, মা-র মৃত্যু, তার মুক্তি শোকের আমেজে মধুর হওয়া মুক্তি তার। (বসু, ১৩৯১ : ২৩২)

মায়ের মৃত্যু শোকে মধুর মুক্তি মিলেছিল আলবেয়ার কামুর outsider উপন্যাসের নায়ক চরিত্র ম্যরসলের। মনে পড়ে যায় *অপরাজিতার* অপুর কথা; 'মায়ের মৃত্যুসংবাদ প্রথম যখন সে তেলি বাড়ির তারের খবরে জানিল, তখন প্রথমটা তাহার মনে একটা আনন্দ, একটা যেন মুক্তির নিঃশ্বাস..একটা বাঁধন ছেঁড়ার উল্লাস...' তাকে আবিষ্ট করেছিল। মৌলির ওপর এই চরিত্রগুলোর বিচ্ছিন্নতাবোধ আর নৈঃসঙ্গ্যচেতনার প্রভাব উপলব্ধি করা যায় সচেতনভাবেই। *মৌলিনাথ* উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু জীবনরহিত কোনো শিল্প নয়, বরং জীবন ও আর্টের এক শুদ্ধতম মিথস্ক্রিয়ায় রচিত শিল্পিত সৃষ্টিকর্মেরই আকাঙ্ক্ষা করেছেন। তাঁর জীবনদর্শনেও এ বিষয়টি প্রগাঢ়ভাবে প্রোথিত ছিল।

গোপিকানাথ রায়চৌধুরী লিখেছেন :

> .....স্বীয় জীবন ও শিল্পগত প্রত্যয়ে ও প্রবণতায় এই কল্লোলপন্থী কথাকোবিদ প্রেম, সংরাগ ও স্বপ্নাতুর বিষণ্নতা দিয়ে যে এক অনন্য জগৎ রচনা করে যেতে পেরেছেন — শিল্পী হিসাবে সেখানেই তার পরম চরিতার্থতা। (চৌধুরী, ১৯৯১ : ১২০)

মৌলিনাথ উপন্যাসে বুদ্ধদেব বসু তাঁর এই দর্শনকে প্রতিষ্ঠিত করতে পেরেছেন উপযুক্ত নির্মাণকলার সাহায্যে।

মৌলিনাথের অন্তর্জীবন রূপায়ণে এই শিল্পরীতি এ উপন্যাসকে পূর্ণতা দিয়েছে।

গ্রন্থপঞ্জি

কামাল, বেগম আকতার ২০০৭। *কবির উপন্যাস।* ঐতিহ্য। ঢাকা।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ ১৯৯৭। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নৈঃসঙ্গ্যচেতনার রূপায়ণ*। বাংলা একাডেমি। ঢাকা।

ঘোষ, সুদক্ষিণা ২০১৩। *সঙ্গ নিঃসঙ্গতা : বুদ্ধদেব বসু।* দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা।

চক্রবর্তী, নিরঞ্জন ১৯৭৮। *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* ষষ্ঠ খণ্ড (সম্পাদক, নিরঞ্জন চক্রবর্তী)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

চৌধুরী, গোপিকানাথ ১৯৮৪। *রবীন্দ্র উপন্যাসের নির্মাণশিল্প।* দে'জ পাবলিশিং। কলকাতা।

চৌধুরী, গোপিকানাথ ১৯৯১। *বাংলা কথাসাহিত্য প্রকরণ ও প্রবণতা।* পুস্তক বিপণি। কলকাতা।

চৌধুরী, ভীষ্মদেব ২০১০। বুদ্ধদেব বসুর 'নির্জন স্বাক্ষর' : মৃত্যু ও স্তব্ধতার কথামালা। *বুদ্ধদেব বসু কাল থেকে কালান্তরে* (সম্পাদক, বেলা দাস)। পুনশ্চ। কলকাতা। পৃ.২৩৫-২৪৭

ঠাকুর, রবীন্দ্রনাথ ১৯৭৬। *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* তৃতীয় খণ্ড (সম্পাদক, নিরঞ্জন চক্রবর্তী)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব ১৯৭০। *বুদ্ধদেব বসুর চিঠি-কনিষ্ঠা কন্যা রুমিকে।* (সম্পাদক, দময়ন্তী বসু সিং)। বিকল্প প্রকাশনী। কলকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব ১৩৯১। *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* নবম খণ্ড (সম্পাদক, নিরঞ্জন চক্রবর্তী)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব ১৯৭০। *রাইনের মারিয়া রিলকে-র কবিতা।* এম. সি. সরকার অ্যান্ড সন্স প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব ১৩৯১। *বুদ্ধদেব বসুর রচনাসংগ্রহ* পঞ্চম খণ্ড (সম্পাদক, নিরঞ্জন চক্রবর্তী)। গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড। কলকাতা।

বসু, বুদ্ধদেব ১৯৮৫। *বুদ্ধদেবের সঙ্গে অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত এবং লোথার লুৎসের ১৬ টি সাক্ষাৎকার।* (অনু. অভিজিৎ দাশগুপ্ত)। [সম্পাদক. উত্তম চৌধুরী]। বাণীশিল্প। কলকাতা।

বন্দ্যোপাধ্যায়, পার্থপ্রতিম ২০১০। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসভাবনা : একটি উপন্যাস। *আমি কে, তা মনে রেখ বুদ্ধদেব বসুর জন্মশতবর্ষ স্মারকসংকলন* (সম্পাদক, সফিকুন্নবী সামাদী, শহীদ ইকবাল এবং অন্যান্য)। বাংলা গবেষণা সংসদ। রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়। পৃ.১৪৯-১৬০

মালাকার, মৈত্রেয়ী ১৪১৪। *বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাস সমীক্ষা ও মূল্যায়ন*। প্রকাশভবন। কলকাতা।

রহমান, গাউসুর ১৪১৫। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসে নির্মাণ। *উত্তরাধিকার*। বাংলা একাডেমি। ঢাকা।

সেন, অর্ণব ২০০৮। বুদ্ধদেব বসুর উপন্যাসচর্চা। *শতবর্ষের আলোকে বুদ্ধদেব*। (সম্পাদক, উত্তম দাশ)। মহাদিগন্ত। কলকাতা।

Friedman, Woolf-Ralph ২০১৩। *The lyrical novel। উপন্যাস চিন্তা : পাঁচজন আধুনিক কবি*। (অনু. রবিন পাল)। বর্ণসংস্থাপন। কলকাতা।

Forster, E.M. 1988. *Aspects of the Novel*. Penguin. England.

Lodge, David 1967. *Language of Fiction*. University of Wisconsin press. USA.